অধ্যায় - ৪১

ছবির কথা, ন্যাকড়া চুরি এবং জ্ঞানেশ্বরী পড়ার কাহিনী।

গত অধ্যায়ে বর্ণিত ঘটনার ন' বছর পর আলী মুহম্মদ হেমাডপন্তের সাথে দেখা করেন এবং নিজের গল্পটা এই ভাবে পুরো করেন -

"একদিন বম্বেতে বেড়াতে-বেড়াতে আমি একটা দোকান থেকে বাবার একটা ছবি কিনি। সেটাকে ফ্রেমে বাঁধিয়ে নিজের বাড়ীর দেওয়ালে টাঙ্গিয়ে দিই। বাবার প্রতি আমার একটা স্বাভাবিক প্রেম ছিল। যখন আমি আপনাকে (হেমাডপন্তকে) সেই ছবিটি দিই তার তিন মাস আগে আমার পা'য়ে একটা ফোঁড়া হয়েছিল। সেটি অস্ত্রোপচার করাতে হয়েছিল। আমি নিজের শ্যালক নূর মুহম্মদের বাড়ীতে ছিলাম। আমার বান্দ্রার বাড়ীতে তিন মাস ধরে তালা দেওয়া ছিল এবং সেই সময় ওখানে কেউ থাকত না। শুধু সুপ্রসিদ্ধ বাবা আব্দুল রহমান, মৌলানা সাহেব, মুহম্মদ হুসেন, সাই বাবা, তাজুদ্দীন বাবা এবং অন্যান্য সন্তরা ছবির রূপে সেখানে বিরাজমান ছিলেন। কিন্তু কালচক্র তাঁদেরও নিস্তার দেয় না। আমি ওখানে (বম্বেতে) রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম, তাহলে আর আমার বাড়ীতে লোকেদের (ছবি) কষ্ট দেওয়া কেন? আমার মনে হয় যেন তাঁরাও জন্ম-মৃত্যু চক্র থেকে মুক্ত নন। অন্যসব ছবিগুলির ভাগ্যে যা ছিল তাই-ই হয়। কিন্তু শ্রী সাইবাবার ছবিটি কি করে রক্ষা পেল, এর রহস্য উদ্‌ঘাটন এখনো পর্যন্ত কেউ করে উঠতে পারেনি। এ থেকে শ্রী সাইবাবার সর্বব্যাপকতা এবং তাঁর অসীম শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

কিছু বছর আগে মুহম্মদ হুসেন থাবিয়া টোপন্ আমাকে (সন্ত) বাবা আব্দুল রহমানের একটা ছবি দেন। সেটা আমি নিজের শ্যালক নূর মুহম্মদ পীর ভাইকে দিয়ে দিই। সেটা গত আট বছর থেকে ওঁর টেবিলেই পড়েছিল। একদিন ছবিটির উপর ওঁর চোখ পড়ে তখন সেটা ফোটোগ্রাফারের কাছে নিয়ে গিয়ে ওটাকে বড় করিয়ে তার প্রতিলিপি কয়েকজন আত্মীয়কেও দেন। একটা প্রতিলিপি আমিও পাই, যেটা আমি নিজের ঘরে রেখেছিলাম। নূর মুহম্মদ সন্ত আব্দুল রহমানের শিষ্য ছিলেন। এক দিন রহমান বাবার দরবারে সব লোকেদের সামনেই নূর মুহম্মদ তাঁকে সেই

ছবিটি উপহার দেওয়ার জন্য তাঁর সামনে রাখেন। ছবিটি দেখেই তিনি রেগে গিয়ে মুহম্মদকে মারতে ছোটেন এবং ওঁকে বাইরে বার করে দেন। নূর মুহম্মদ অত্যন্ত ক্ষুন্ন ও বিষন্ন হন। উনি ভাবেন অতগুলো টাকা মিছিমিছিই খরচ করলেন যার পরিণামে কেবল গুরুর বিরুপতা ও অসন্তোষ জুটলো। ওঁর গুরু মূর্তি পূজোর বিরোধী ছিলেন। নূর মুহম্মদ ছবিটা হাতে নিয়ে 'অপোলো' বন্দর পৌঁছন এবং একটা নৌকো ভাড়া করে সমুদ্রের মাঝামাঝি সেই ছবিটা বিসর্জন দিয়ে আসে। উনি নিজের আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে সব ছবিগুলি (মোট ছটি) ফেরত আনিয়ে নেন। এক জেলের সাহায্যে সব ক'টি ছবি বান্দ্রার কাছে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলেন।

সে সময় আমি আমার শ্যালকের বাড়ীতে ছিলাম। নূর মুহম্মদ আমায় পরামর্শের সুরে বলেন- "যদি তুমি সব সন্তদের ছবি সমুদ্রে ভাসিয়ে দাও তাহলে শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবে।" এই শুনে আমি ম্যানেজার মেহতাকে নিজের বাড়ী পাঠাই এবং বাড়ীতে টাঙ্গানো সব ছবিগুলো সমুদ্রে ভাসিয়ে দিতে বলি। পাঁচ মাস পর বাড়ী ফিরে বাবার ছবিটি যেমন-কে-তেমন টাঙ্গানো দেখে আমার খুব আশ্চর্য্য লাগে। আমি বুঝে উঠতে পারি না যে মেহতা অন্য সব ছবিগুলো তো বার করে ভাসিয়ে দেয়, তবে কেবল এই ছবিটিই কি করে থেকে গেলো। আমি তক্ষুনি সেটি নামিয়ে নিই এই ভেবে যে, আমার শ্যালকের চোখ পড়লে সে এটাও নষ্ট করে ফেলবে। যখন আমি এই চিন্তা করছিলাম যে কে এই ছবিটি যত্ন করে সামলে রাখতে পারবে, তখন যেন স্বয়ং সাইবাবাই আমায় নির্দেশ দেন- 'ইস্মু মুজাওরের কাছে গিয়ে তার সাথে পরামর্শ করো এবং তার কথা মত কাজ করো।' আমি মেঠলানা সাহেবের সাথে দেখা করি এবং ওঁকে সব কথা জানাই। কিছুক্ষণ ভাবার পর উনি এই স্থির করেন যে সেটি আপনাকেই (হেমাডপন্ত) দেওয়া উচিত। একমাত্র আপনিই এইটি ভালো ভাবে সামলে রাখতে পারবেন। তাই আমরা দুজনে আপনার বাড়ী আসি এবং উপযুক্ত সময় এই ছবিটি আপনাকে দিই। এই ঘটনার মাধ্যমে বোঝা যায় যে বাবা ত্রিকালদর্শী এবং তিনি কি অপূর্ব কৌশলে সমস্যার সমাধান করে ভক্তদের ইচ্ছে পূরণ করেন।"

নিম্ন লিখিত কাহিনী এই বিষয়ের প্রতীক যে যাঁরা অধ্যাত্মিক বিষয়ে আগ্রহী তাঁদের বাবার কত ভালোবাসতেন এবং কিভাবে তাঁদের সমস্ত অসুবিধে দূর করে তাঁদের সুখী করতেন।

ন্যাকড়া চুরি এবং জ্ঞানেশ্বরীর পঠন ঃ-

শ্রী বি. ভি. দেবের বহু দিনের ইচ্ছে অন্যান্য ধার্মিক গ্রন্থ গুলির সাথে সাথে 'জ্ঞানেশ্বরী'ও পাঠ করেন। (জ্ঞানেশ্বরী শ্রী জ্ঞানেশ্বর মহারাজের দ্বারা রচিত ভগবদ্‌গীতার মারাঠী টীকা) উনি রোজ ভগবদ্‌গীতার একটা অধ্যায় এবং অন্যান্য গ্রন্থের কিছু-কিছু অংশ পাঠ করতেন। কিন্তু জ্ঞানেশ্বরীর পাঠ শুরু করতেই কোন না কোন বাধা উপস্থিত হত। তিন মাসের ছুটি নিয়ে উনি শিরডী আসেন। সেখান থেকে নিজের বাড়ী যান বিশ্রামের জন্য। অন্যান্য শাস্ত্র-গ্রন্থ তো উনি পড়তেন ঠিকই কিন্তু যেই 'জ্ঞানেশ্বরী' খুলে বসতেন অমনি নানা রকমের এলোমেলো দুঃশ্চিন্তা ওঁকে এমন ভাবে ঘিরে নিত যে অগত্যা তাঁকে পাঠ বন্ধ করতে হত। অনেক চেষ্টা করার পরও যখন দু-চার লাইনও পড়ে উঠতে পারলেন না, তখন উনি স্থির করেন- "যখন দয়ানিধি শ্রী সাই-ই কৃপা করে এই গ্রন্থপাঠ করার আদেশ দেবেন তখনই শুরু করব।' ১৯১৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে উনি সপরিবারে শিরডী আসেন। শ্রীযোগ ওঁকে জিজ্ঞাসা করেন- "আপনি কি রোজ জ্ঞানেশ্বরী পাঠ করেন?" শ্রীদেব উত্তর দেন যে- "আমার ইচ্ছে তো খুব হয় কিন্তু এখনো সফল হতে পারিনি। যখন বাবা আদেশ করবেন তখনই পাঠ শুরু করব।" শ্রী যোগ পরামর্শ দেন- "গ্রন্থটির একটি প্রতিলিপি কিনে বাবাকে নিবেদন করুন। তিনি সেটি স্পর্শ করে ফিরিয়ে দেওয়ার পর পাঠ শুরু করলে লাভ হবে।" শ্রীদেব বলেন- "আমি এই প্রণালীটি ঠিক মনে করি না। বাবা তো অন্তর্যামী এবং আমার হৃদয়ের ইচ্ছে তাঁর কাছে কি করে গুপ্ত থাকতে পারে? তিনি স্পষ্ট শব্দে আদেশ দিয়ে আমার মনের ইচ্ছে কি পূরণ করবেন না?"

শ্রীদেব বাবার দর্শন করেন এবং এক টাকা দক্ষিণা দেন। তখন বাবা ওঁর কাছে আরো কুড়ি টাকা দক্ষিণা চান, সেটিও দিলেন। রাত্রে শ্রীদেব বালকরামের সাথে দেখা করেন এবং ওঁকে জিজ্ঞাসা করেন- "আপনি কি ভাবে বাবার ভক্তি ও কৃপা প্রাপ্ত করেন?" বালকরাম বলেন- "আমি কাল আরতি শেষ হওয়ার পর আপনাকে সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত শোনাব।" পরের দিন যখন শ্রীদেব দর্শনার্থে মস্‌জিদে যান তখন বাবা ওঁর কাছে আবার কুড়ি টাকা দক্ষিণা চান এবং উনি খুশী হয়ে সেটি দেন। মস্‌জিদে ভীড় দেখে উনি একদিকে গিয়ে একান্তে বসেন। বাবা ওঁকে ডেকে নিজের কাছে বসান।

আরতি শেষ হওয়ার পর যখন সবাই নিজের-নিজের বাড়ী ফিরে গেছে, তখন শ্রীদেব বালক রামের সঙ্গে দেখা করে ওঁর পূর্ব ইতিহাস জানার ইচ্ছে প্রকাশ করেন এবং বাবার দেওয়া উপদেশ ও ধ্যানাদির সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। বালকরাম এই

সব প্রশ্নগুলির উত্তর দিতেই যাচ্ছিলেন, এমন সময় চন্দ্রু এসে জানায় যে শ্রীদেবকে বাবা ডাকছেন। শ্রীদেব মস্‌জিদে যেতেই বাবা ওঁকে জিজ্ঞাসা করেন যে উনি কার সাথে এবং কি কথাবার্তা বলছিলেন। শ্রীদেব উত্তর দেন যে উনি শ্রী বালকরামের কাছে তাঁর কীর্তির গুণগান শুনছিলেন। তখন বাবা ওঁর কাছে আবার ২৫ টাকা দক্ষিণা নিয়ে ওঁকে ভেতরে নিয়ে যান। আসন গ্রহণ করার পর ওঁর উপর দোষারোপ করে বলেন- "আমাব অনুমতি না নিয়েই তুমি আমার ন্যাকড়া (পুরনো কাপড়ের টুকরো) চুরি করেছ।" শ্রীদেব উত্তর দেন- "ভগবান! যতদূর আমার মনে পড়ে, আমি তো এরকম কোন কাজ করিনি।" কিন্তু বাবা কারো কথা কোথায় শুনতেন? তিনি শ্রীদেবকে ভালভাবে খুঁজতে বলেন। শ্রীদেবও তন্নতন্ন করে খোঁজেন, কিন্তু কোথাও কিছু পান না। তখন বাবা রেগে গিয়ে বলেন- "এখানে তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। তুমিই চোর। তোমার চুল তো পেকে গেছে আর এত বুড়ো হয়ে গিয়েও কি না তুমি এখানে চুরি করতে এসেছ?" এরপর বাবার চোখ রাগে লাল হয়ে ওঠে। তিনি ভীষণ ভাবে গালাগালি করতে শুরু করেন। শ্রীদেব শান্ত হয়ে সব শুনছিলেন। মনে ভাবলেন- এরপর বুঝি মারই খেতে হবে। প্রায় এক ঘন্টা পর বাবা ওঁকে 'ওয়াড়া'য় ফিরে যেতে বলেন। ওয়াড়ায় ফিরে উনি যোগ ও বালকরামকে সমস্ত ঘটনাটি খুলে বললেন। দুপুরের পর বাবা সবার সাথে শ্রীদেবকেও ডেকে পাঠান। বলেন- "বোধহয় আমার কথাগুলি এই বৃদ্ধের মনে কষ্ট দিয়েছে। ইনি চুরি করেছেন কিন্তু স্বীকার করছেন না।" তিনি শ্রীদেবের কাছে আবার বারো টাকা দক্ষিণা চান। শ্রীদেব সেটি আনন্দ সহকারে জোগাড় করে বাবাকে দিয়ে প্রণাম করেন। তখন বাবা দেবকে বলেন- "তুমি আজকাল কি করছ?" দেব উত্তর দেন- "কিচ্ছু না।" তখন বাবা বলেন- "পুঁথি (জ্ঞানেশ্বরী) পাঠ করা শুরু করো। যাও, ওয়াড়ায় বসে রোজ পড় আর যেটুকু তুমি পড়বে তার অর্থ অন্যদের প্রেম ও ভক্তি ভরে বোঝাবে। আমি তোমায় সোনার কাজ-করা দামী শাল উপহার দেওয়ার জন্য সব সময় প্রস্তুত রয়েছি। তাহলে তুমি অন্যদের কাছে ছেঁড়া কাপড়ের টুকরোর আশায় কেন যাও? এটা কি তোমায় শোভা দেয়?"

পুঁথি পড়ার আদেশ পেয়ে দেব অতি প্রসন্ন হন। উনি ভাবেন- "আমি যা চাইছিলাম সেটাই পেয়ে গেছি এবং এবার আমি সচ্ছন্দে (জ্ঞানেশ্বরী) পড়তে পারব।" উনি বাবাকে আবার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেন এবং বলেন- "হে প্রভু! আমি আপনারই শরণে এসেছি। আপনার অবোধ শিশু। আমায় পাঠ করতে সাহায্য করবেন।" এবার উনি ন্যাকড়ার অর্থ স্পষ্ট বুঝতে পারেন। বালকরামের কাছে যা জানতে চাইছিলেন সেটা ন্যাকড়া (টুকরো) তুল্য। এই সব বিষয়ে বাবা এই ধরনের ব্যবহার পছন্দ করতেন না। তিনি

স্বয়ং সব রকমের প্রশ্নের উত্তর বা সন্দেহ দূর করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। অন্যদের কাছে নিরর্থক জিজ্ঞাসাবাদ করা তিনি ভালোবাসতেন না। তাই তিনি শ্রীদেবের উপর রেগে যান এবং ওঁকে বকেন। শ্রীদেব এই শব্দগুলিকে বাবার শুভ আশীর্বাদ মনে করেন এবং সন্তুষ্ট মনে বাড়ী ফিরে যান।

এই ব্যাপারটা এখানেই শেষ হয় না। আদেশ দেওয়ার পর বাবা শান্ত হয়ে বসে থাকেন নি। এক বছর পর তিনি শ্রী দেবের কাছে গিয়ে খোঁজ নিয়েছেন পুঁথি পাঠ কতদূর এগোল। ২রা এপ্রিল ১৯১৪ সাল, বৃহস্পতিবার বাবা স্বপ্নে শ্রীদেবকে জিজ্ঞাসা করেন- "তুমি কি পুঁথি ঠিক ভাবে বুঝতে পারছ?" দেব উত্তর দেন- 'না'। তখন বাবা বলেন- "আর কখন বুঝবে?" শ্রীদেবের চোখ থেকে টপ্-টপ্ করে জল পড়তে থাকে এবং উনি কাঁদতে কাঁদতে বলেন- "হে ভগবান, যতক্ষন আপনার কৃপা রূপী মেঘ বর্ষন না হবে ততক্ষন তার অর্থ বোঝা আমার পক্ষে অসম্ভব। এই পাঠ ভারস্বরূপই রয়ে যাবে।" তখন বাবা বলেন- "আমার সামনে পড়ে শোনাও। তুমি পড়ার সময় বড্ড তাড়াহুড়ো করো।" তারপর জিজ্ঞাসা করায় তিনি আধ্যাত্ম বিষয়ক অংশটি পড়তে বলেন। শ্রীদেব পুঁথি আনতে যান এবং এই সময়ে ওঁর ঘুম ভেঙ্গে যায়। এবার পাঠক স্বয়ং এই কথা কল্পনা করতে পারেন যে দেব এই স্বপ্নের পর কতখানি আনন্দ অনুভব করেছিলেন। শ্রীদেব এখনো (১৯৪৪ সাল) জীবিত আছেন এবং চার-পাঁচ বছর আগে ওঁর সাথে আমার দেখা হয়েছিল। আমি যতদূর জানি উনি এখনো জ্ঞানেশ্বরী পাঠ করেন। ওঁর জ্ঞান অগাধ ও পূর্ণ। সাই লীলার বিষয়ে লেখা ওঁর প্রবন্ধে এ কথা স্পষ্ট বোঝা যায় (তারিখ ১৯.১০.১৯৪৪)।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।